আবুলকান্দাঢেউ

আবুলকান্দাঢেউ

দুখু বাঙাল

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ : এপ্রিল ২০২৩

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

কম্পিউটার কম্পোজ
মীর বায়োজিদ বোস্তামী

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মোঃ মহিদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : ফাতেমা জোহরা

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Abulkanda Dheu: An Autobiography by **Dukhu Bangal**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : Nobborso 1430 Bongabdo: April 2023

Price : 600.00
US $ 10

ISBN 978 984 97410 4 6

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪
https://www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

মজদুর ও মজলুমদের প্রতি

প্রাককথন

এই বইয়ের ‘আমার মা’ ও ‘ছেলেবেলার কত কথা’র পিতার অংশটুকুন লেখা হয়েছিল আমার মা-বাবার জীবিত অবস্থায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক পত্রিকা অগ্রপথিক এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক নবারুণ সম্পাদক যথাক্রমে মোহাম্মদ আনোয়ার কবির ও নাসরীন জাহান লিপি– এই দুই জনের অনুরোধে; যা যথাসময়ে নভেম্বর ২০১৩ ও অক্টোবর ২০১৫ সংখ্যায় যথারীতি ছাপা হয়। বইয়ের বাকি অংশ লেখা হয় বেশ কয়েক বছর পরে মা-বাবার অবর্তমানে। বইটি সম্পাদনাকালে মা-বাবার কথা মনে রেখে তাঁদের জীবিতকালীন লেখার ভাষার বর্ণনা অক্ষত রাখায় পরবর্তী লেখার সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টিতে পূর্ববর্তী লেখার কোথাও কোথাও অসঙ্গতি দেখা দেবে। এই অসঙ্গতির জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

জীবনের আলোছায়া নিয়ে রচিত হলেও এ কোনও জীবনীগ্রন্থ বা কোনও জীবনদর্শন নয়, বড়জোর দ্বিসত্তার অধিকারী একজন কবি ও প্রশাসকের দৃষ্টির মুগ্ধতা। বিচিত্র মানসিক গতিপথের পথিক প্রসারিতবোধের কবির অভিজ্ঞতার সরণি আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় একদম প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতো রূঢ়বাস্তব পদটি কীভাবে একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে এবং কীভাবে বারবার দ্বন্দ্ব-বাহাসে লিপ্ত হয়ে দূরত্ব রচিত হয়েছে, আছে তারই খানিকটা বর্ণনা। কবিজন্ম আর কোতোয়াল– চারপাশের প্রচ্ছন্ন তির্যক হাসির বাণে বারবার বিদ্ধ হতে হয়েছে আমাকে। আবার চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় ঘরেবাইরে সমালোচিত হয়েছি নানাভাবে। কবিতা লিখে কী পেয়েছি, এই সওয়ালের জবাবে শুধু বলব– নির্বিকার চিত্তে মসনদ ত্যাগের মহিমান্বিত সাহসের ঐশ্বর্যে ধন্য যে হৃদয়, পাওয়া-না পাওয়ার মতো ক্ষুদ্র বিতর্কে তাকে দীর্ণ করো না; তাকে হেঁটে যেতে দাও সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চাঁদোয়াসড়কে, সমুদ্রের বুক চিরে যা তার নিজেরই সৃষ্টি।

কোর্ট সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যতীত কোনও ধরনের পূর্বনোট ছাড়া সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে লিখিত হওয়ায় ঘটনার সময় বা তারিখের ক্ষেত্রে হেরফের হতে পারে, কারও নামের বানানে ভুল থাকতে পারে– এক্ষেত্রে সময় ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সহৃদয় পাঠকের সহযোগিতা পেলে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে। কোনও ঘটনার বর্ণনায় কাউকে যাতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে না হয়, এই কারণে কোথাও

কোথাও প্রতীকী বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারি নির্দেশনায় বেতারের স্থলে রেডিও শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। সময়টা ধরে রাখতে এ বইয়েও ব্যবহৃত হয়েছে রেডিও শব্দটির। অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদটিও থানা নির্বাহী অফিসার বা টিএনও হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পরিবর্তিত সময়ের বাস্তবতায়। পুলিশের চাকরির সুবাদে আমার সুযোগ হয়েছে কত জীবনের নীরব ত্যাগ ও বিসর্জনের আলোকচ্ছটা দেখার। সুযোগ হয়েছে অসুরের পায়েদলা কুসুমের আকাশবিদীর্ণ আর্তনাদ প্রত্যক্ষ করবার। কত সুন্দর, কত কুৎসিত– সে সব দৃশ্য! এগুলোও তো লেখা যেত। এই জাতীয় জিজ্ঞাসায় শুধু বলব, আমি কবি– সব উন্মোচন করা আমার কাজ নয়। মহৎ কোনও বাণী প্রচারিত না হলেও এ বই হঠাৎ হয়ে উঠতে পারে নীড়হারা স্বপ্নখোয়া কোনও আবুলের জীবনহীন জীবনের আশার শিরীষ।

নামে কী আসে যায়। তবু বইটির নামকরণে খানিকটা ভাবনায় পড়তে হয়েছে আমাকে। জীবনের আলোছায়া ও আবুলকান্দা ঢেউ নামটা যথার্থ মনে হলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি দীর্ঘ নামের বিরোধী বিধায় নাম দেওয়া হলো– আবুলকান্দা ঢেউ। আবুলকান্দা কেন? সাধারণ মানুষ– আবুলদের চাতুর্যহীন ভেউ ভেউ করে ঢেউ তোলা কান্নায় কোনও কৃত্রিমতা বা কোনও রাখঢাক থাকে না। কাঁদতে গিয়ে কোনও রুমাল বা টিস্যুও ওঠে না এদের হাতে। এরাই সংখ্যাধিক্য, এদের বাদ দিয়ে পৃথিবী হয় না। 'এখানেও আছে ধুলো-বালি, কাদা-পেরি আর অগণিত চাতুর্যহীন আবুলের ভিড়; যারা ধন্যবাদের দাবি না করে যুগে যুগে কালে কালে সারাদেহে ফুটিয়েছে লবণকুসুম আর ঝরিয়েছে রক্তগোলাপ। এদের হাতেই রচিত হয়েছে মিশরের পিরামিড, চীনের মহাপ্রাচীর, ভারতবর্ষের তাজমহল কিংবা আজকের আমেরিকার টু ইন টাওয়ার। ফরাসি বা রুশ বিপ্লবসহ যে কোনও বিপ্লবে এরাই প্রাণশক্তি। যেখানে জীবন থেমে যায়, সেখানেও এই আবুলরা গুনগুন কণ্ঠে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে খুঁড়তে থাকে কোনও বন্ধুর কবর; এরা অপরাজেয়'। আত্মরক্ষামূলক স্বার্থপর পৃথিবীতে ত্যাগের মহিমায় আজও এরা অম্লান; অতএব আবুল এবং আবুলকান্দা ঢেউ।

নববর্ষ ১৪৩০
১৫ এপ্রিল ২০২৩ — দুখু বাঙাল
ছোট ডালিমা
বাউফল, পটুয়াখালী

সূচিপত্র

আমার মা ১১
ছেলেবেলার কত কথা ২৯
'ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি' ও আমার নেতৃত্বে
প্রতিষ্ঠিত শহিদ মিনার ৭০
আমার স্মৃতিতে বাউফলের মুক্তিযুদ্ধ ৭৪
সেনাবাহিনীর হাতে দুই দুবার আটক ৭৯
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : দেয়াল লিখন ও নব্বইয়ের
স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের শহিদ ইব্রাহিম সেলিম ৮১
আমার কলেজজীবন ৮৮
ঢাকা গমন ও সরকারি পদে যোগদান ৯১
বাছাইপর্ব ও দারোগা পদে নির্বাচিত ৯৬
প্রশিক্ষণে যাত্রা ৯৭
পুলিশ একাডেমিতে এক বছরের বন্দিত্ব ১০০
চাটগাঁপর্ব : শিক্ষানবিশ থেকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১১৫
পূর্ণ হলো ভালো মানুষ আর ভালো ওসি দেখার সাধ ১৫১
চট্টগ্রাম গণহত্যা ও শেখ হাসিনা ১৫৭
লোমহর্ষক চট্টগ্রাম গণহত্যা ১৬৯
পথের কাহিনী ও খুলনায় আগমন ১৭৫

সাতক্ষীরা জেলাপর্ব ১৮১
বাগেরহাট জেলাপর্ব ১৯৯
চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানা ২৪২
কুষ্টিয়া থানা ২৫০
সন্দ্বীপ থানা ২৫৩
নড়াইল থানা ২৬১
মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানা ও স্বেচ্ছা-অবসর ২৬৮
অতঃপর অবসর ও বিচিত্র ভাবনা ২৭৯
হজপর্ব ২৯৪
পুলিশের কতিপয় দিক নিয়ে কিছু কথা ৩০৪
খুলনার তপোবনে ৩১৩

আমার মা

ছেলেবেলায় মা বলতেন, ভোর আসে শাপলার পাপড়িতে কিংবা ঘাসের ডগায় বেড়ালের মতো পা ফেলে নৈঃশব্দ্যে। আর সন্ধ্যা? সন্ধ্যা ঘনায় বাদুড়ের ডানায় ভর করে শব্দ ছড়িয়ে। আরও বলতেন, জগতে অসীম অন্ধকার বলে কিছু নেই; যতক্ষণ একটি তারা জ্বলছে আকাশে অথবা বিরুদ্ধ বাতাসেও লড়াই করে আলো দিয়ে যাচ্ছে একটি ক্ষুদ্র জোনাকি– ততক্ষণই জীবন, ততক্ষণই আশা। মায়ের আঁকা এই ছবি চিরদিনের মতো পাথর হয়ে জ্বল জ্বল করছে আমার স্মৃতির আয়নায়।

আছিয়া খাতুন– আমার মা। ধবল ফুলের ধবল রানি। দাদি-নানি পাঁচ মামা আর একমাত্র খালার কলিজার পুত্তলি– 'আছি'। জগৎ-মাঝে এই নামটিই যেন তাঁদের কাছে শাশ্বত স্থিতির এক জীবন্ত প্রতীক। তিন মাসের মাতৃগর্ভে থাকতে অদেখা তরুণ বাবার জান্নাত গমন। জন্মের ছয় মাসে মা-হারা; যাকে বলে মা-বাবার স্মৃতিশূন্য ঝাড়ে-বংশের এতিম। প্রথম সন্তান হিসেবে আমিই তাঁর সাত জনমের বাপ। সাদা ফুলের পিয়াসী হলেও তারুণ্যে, যৌবনে উঠোনের কিনারের রক্তজবা গুঁজতে দেখেছি চুলের খোঁপায়। এ আমার শৈশব আর কৈশোরের আবছা আবছা স্মৃতি। সাত পুত্র আর দুই কন্যার মা। দুই পুত্র শৈশবেই পাড়ি দেয় নানার পথে। বাকি সাতটি। ঝরঝরে সব রক্তজবা। মাতৃত্বের অহংকারে মুখরিত আমার মায়ের সংসার। ভাইবোনদের দুই তিন ক্রমিকের দিকে অর্থাৎ সন্তানের সংখ্যা বাড়তে থাকলে এবং আমরাও বড় হতে থাকলে উবে যেতে থাকে তাঁর লাল ফুলপ্রিয়তা। একহারা গড়নের আমার মা অপূর্ব সুন্দরী। দুধে আলতায় মেশানো তাঁর গায়ের রং। ওস্টিওপরোসিস রোগে ও বয়সের ভারে কাবু হয়ে পড়লেও দীর্ঘ কেশের এই মেয়েটির মাথা থেকে একগাছি পাকা চুল খুঁজে পেতে ঘাম ঝরাতে হতো যে কাউকে। জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত দাঁতগুলো ছিল একদমই যৌবনবতী।

মা তেমন কোনও শিক্ষিত ছিলেন না। তবু মা-ই আমার প্রথম শিক্ষক প্রথম কবি এবং প্রথম দার্শনিক। পৃথিবী নামক এই গ্রহে আগমনের শুরুতেই আমার তৃষ্ণার্ত আত্মা শীতল হয় মাতৃবক্ষের

অমৃতসুধায়। মায়ের সঙ্গেই আমার প্রথম কথা। মায়ের হাত ধরেই প্রথম তির তির করে দাঁড়ানো। কোলে পিঠে চড়ে মা-ছেলের একবার আকাশের তারা গোনা আর একবার দিঘির জলে দূর নক্ষত্রের মুখ দেখা। সংকটে সম্পদে মনে হয় মা পেছনে দাঁড়িয়ে।

আমার শৈশবের প্রথম বসন্তের এক শুক্রবারের সকাল। উঠোন ভরা অসংখ্য লোক। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন। জমকালো মিলাদ। মিষ্টি বিতরণ। উপস্থিত দক্ষিণ পাড়ার জুব্বা ও পাগড়ি পরিহিত ধবল শ্মশ্রুধারী হোসেন মুন্সি– আমার প্রথম মেয়াছাপ। মা তাঁর হাতে তুলে দিলেন ছেপারা আর সীতানাথ বসাকের আদর্শলিপি। স্লেট-পেনসিলসহ বোনাস একজোড়া বেত। মেয়াছাপকে উদ্দেশ করে বললেন, মাংস আপনার, হাড় আমার। শুরু হলো এক দীর্ঘ সাঁকো পার হওয়ার প্রথম কসরত। এর আগে মা-ফুফু আর চাচার কাছে আলিফ-বা অথবা অ-আ ক-খ। এই বছরই বসন্ত শেষের আরেকটি অনুষ্ঠান। শ্মশ্রুধারী ওসতা কাকার খুরের একপোচে সম্পন্ন হলো আমার মুসলমানি। যা কষ্ট! শীতের সকালে উঠোনের রোদে মাদুর পেতে দ্রুত গতিতে চলত আমার অনিচ্ছার বিদ্যার ঘোড়াটি। হাফশার্ট ও হাফপ্যান্টের ওপর জড়ানো রঙিন চাদর বা দাদির সেলানো নকশি কাঁথা। নামতা পড়তাম দুলে দুলে– দুই এক্কে দুই, দুই দুগুণে চার। মাদুর-সীমান্তে একজোড়া লালসাদা স্পঞ্জের স্যান্ডেল নিয়ে নানান ছন্দে কসরত করত আমার প্রিয় হুলো বেড়াল যোগী। খেলার মধ্যেও হোসেন মুন্সির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বাইচালির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত আমার মতিগতির ওপর। প্রতিবারেই থাকত বাসন ভরতি গুড়সমেত মুড়ি বা খই। বাড়তি থাকত কয়েক খণ্ড নারকেল-ফালি। বিদ্যালাভের প্রলম্বিত হাঁপের ফাঁকে ফাঁকে খাবারগুলো নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়ে হয়ে পড়ত নিস্তেজ ও নিষ্প্রাণ। একদম ওদা। শিক্ষক মশাইর বাসনটি সাবাড় হয়ে যেত সেই কখন। মা-জননীর মাঝে মাঝে সচকিত ঘুরে যাওয়া। ভাবখানি এই– বাপু, গিলছো যখন পড়া, তা খাবারগুলো জিরাক খানিক।

পরের বছরের শুরুতেই মেয়াছাপের কঠিন আর কঠোর শাসনের দেয়াল পার হতে না হতেই পড়ে গেলাম বেত্রসজ্জিত কয়েকটি বাঘের কবলে। আমার গ্রামের স্কুল– নাজিরপুর-ছোট ডালিমা প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুল বলতে পাকা কোনও ইমারত বা ভবন নয়, মাটির

ভিতের টিনের চালা আর টিনের বেড়ার ঘর। বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসে প্রায় প্রতিবার ধুয়ে যেত ঘরের মাটি। ছুটির সময় রোদ, বৃষ্টি বা বিশ্রামে স্কুলঘরের গোরপাটের তল দিয়ে পৃষ্ঠদেশ খানিকটা বাঁকা করে ঢুকে পড়ত এলাকার সব ছাগল-গরু। মানুষ করবার জন্য ক্ষুদে সব মানবসন্তানকে আসতে বাধ্য করা হতো যে গৃহে, পশুসন্তানরাও বুঝি মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সমবেত হতো সেই তীর্থের ছায়াতলে। তখন গ্রামে কোনও পাকা ঘর বা পাকা রাস্তা ছিল না। প্রাইমারি সেকশনের বাইরে এখানে ছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রাইমারি ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ঠাহর পাই বড় হয়ে। প্রাইমারির প্রধান শিক্ষক খালেক স্যারের হাতে থাকত ডাবল বেত। বাড়ি ও স্কুল, সর্বত্র শাসন আর শাসন। লেখাপড়ায় ঢিলেমি বা ঠিক ঠিক আদবকায়দার ক্রুটিতে যখন তখন বেত পড়ত পিঠে। মায়ের ভাবখানা এই, সন্তানের শরীরখানি শিক্ষক আর পাড়ার মুরব্বিদের কাছে লিজ না দিলে মানুষ হবে কী করে। সুপোরি গাছের মতো সহজ সরল হয়ে উঠবার যত নীতিবাক্য। দম বন্ধ হয়ে আসার পালা। ইচ্ছে হতো পাখি হয়ে উড়ে যাই দূর কোনও দেশে। ভেবে অবাক হই, আমার মা-বাবা শিক্ষক সর্বোপরি পূর্বপুরুষরা কত শুদ্ধ মানুষ ছিলেন। আমার স্কুলজীবনের প্রথম ঘণ্টা, দিগন্ত ছাড়িয়ে যাওয়া যে ঘণ্টাধ্বনির বিস্তরণ আজও সমানভাবে ঘটে চলেছে আমার দুই কানের দুই নিঝুম উপত্যকায়। তখন শিক্ষকদের হাতে বেত ছিল সাধুবাদের পরম বস্তু। স্কুলে আসাযাওয়ার পথটি হয়ে উঠল আমার মায়ের দৃষ্টির মহাসড়ক। সেদিন স্কুলে ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি বিতরণে না ছিল আনন্দ, না ছিল কোনও স্বাদ। এইটে পড়াকালীন বন্ধুদের নিয়ে খেয়ালের বশে একরাতের মধ্যেই আমার নেতৃত্বে স্কুল মাঠে গড়ে তুলি প্রথম শহিদ মিনার। পরবর্তীতে ঘটে আমার স্কুলবদল। বাবা ভর্তি করে দেন থানা সদরের স্কুলে, বাউফল হাইস্কুল।

প্রাচীনতম এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ রাশভারী স্বভাবের মানুষ হলেও ছাত্রদের প্রতি ছিল তাঁর অশেষ মমত্ব। তিনি ছিলেন ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (EPCS) শেষতম ব্যাচের উত্তীর্ণ সদস্য। স্বাধীনতার পর একপর্যায়ে তিনি সরকারি পদে যোগদান করেন। এসএসসির ভূগোল

পরীক্ষার আগের দিন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে কী একটা বিষয় নিয়ে থানা সংলগ্ন বাজার রোডে প্রকাশ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। দাঙ্গার মাঝখানে পড়ে ডিএন বেপারী নামক এক ম্যাজিস্ট্রেটও আহত হন। থানায় মামলা হয়। এই মামলায় ছাত্র ইউনিয়নের একজন হিসেবে আমাকেও আসামি করা হয়। প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন আহমেদের হস্তক্ষেপ ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছাত্রলীগের আব্দুল ওহাব খানের সহযোগিতায় আমার পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়; দুজনেরই কাছে আমার অশেষ ঋণ। নাইন-টেনে অঙ্কের স্যার ছিলেন জাকির সেনগুপ্ত। দূর ঝালকাঠি থেকে তরুণ বয়সে শিক্ষকতা করতে আসা সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত কখন কীভাবে মূল নাম হারিয়ে ফেলে হয়ে উঠলেন জাকির সেনগুপ্ত, আজ আর তা জানার উপায় নেই। কালো মানুষও যে সুন্দর হন তা এই প্রবীণ শিক্ষককে না দেখলে বুঝা যাবে না। তিনি ছিলেন ক্লাস নাইনে আমাদের ক্লাস টিচার। বোর্ড রেজিস্ট্রেশনের সময় তিনি আমার ডাক নামটিও মূল নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। সকালে কাছারি বাড়ির দিঘির স্বচ্ছ জলে স্নান সেরে চকচকে কাঁসার ঘটিতে জলসমেত তিনি যখন নত দৃষ্টিতে ঘরে ফিরতেন, সে এক দৃশ্য বটে। ঘটিটি দুই হাতে ধরা থাকত সামনের দিকে। ডান কাঁধে জলনিঙরানো ধুতিখানি আর বাম কাঁধে থাকত গামছা। কারও সালামের জবাব দিতেন কি-না তা বোঝার সাধ্য ছিল না। মনে হতো জগতের সকল অশুচিতার জঞ্জালের ভিড়ের মধ্যে প্রাণপণ পথ করে সামনে এগিয়ে চলেছেন তিনি। এই আদর্শ শিক্ষকটিও আমার জীবনে এক স্মৃতি হয়ে আছেন।

বঙ্গবন্ধু নতুন জেলা পটুয়াখালীর বাউফল থানা এলাকায় আসেন দুই বার। ৭০-এর নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে ১৮ জুলাই দুপুরের পর তিনি কালাইয়া বন্দরের ধানহাটায় বিশাল জনসভায় ভাষণদান করেন। তিনি স্পিডবোট যোগে কালাইয়া যাওয়ার পথে ছাত্রলীগের সভাপতি আবুল কালাম খানের নেতৃত্বে থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওয়াদুদ মিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হক মিয়া, হেমায়েত মিয়া, প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদসহ শত শত ছাত্র-জনতা বাউফল-কালাইয়া নদীতে নৌকা-ট্রলার ইত্যাদি দিয়ে বেরিকেড সৃষ্টি করলে বঙ্গবন্ধু বাউফল হাইস্কুল মাঠের সিঁড়ি দিয়ে হাসতে হাসতে বোট থেকে নদীর তীরে স্কুল মাঠে উঠে আসেন এবং একটি রিকশায় আকাশ-

বাতাস প্রকম্পিত জয় বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু মুহুর্মুহু স্লোগানের মধ্য দিয়ে তাঁকে পাবলিক ফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে কয়েক হাজার লোক এখানে সমবেত হয়। বঙ্গবন্ধু এই পথসভায় জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, আমি কালাইয়া জনসভায় বক্তব্য দেবো, আপনারা কালাইয়া আসেন। আমি তখন বাউফল হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। এমন দীর্ঘদেহী সুন্দর সুপুরুষ এবং বজ্রকণ্ঠ ও মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে আকর্ষণ করার সম্মোহনী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আমার একপাতার জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমার কিশোর চিত্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এক অজানা অথচ অব্যর্থ আশার আলো– হ্যাঁ, তিনিই পারবেন সব। এই স্মৃতি আজও আমাকে আবেগ তাড়িত করে তোলে। তাঁর নেতৃত্বে একাত্তরে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা আমাদের বড় প্রাপ্তি।

দুপুরের পরপরই বঙ্গবন্ধু কালাইয়ার ধানহাটার জনসভায় ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহচর আব্দুল গফুর মিয়া এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। এই জনসমুদ্রে তিনি অনেক কথা বলেন। প্রাদেশিক পরিষদের স্থানীয় সদস্য পদপ্রার্থীকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন, যেহেতু আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, সেহেতু যাঁকে প্রার্থী দিলাম তাঁকে আপনারা ভোট দেবেন। ‘কলাগাছ’ হলেও তাঁকে ভোট দেবেন। আমাদের হাতে বেশি সময় নাই। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ ও অন্যান্য। বারোটার মধ্যেই সভাস্থল ধানহাটা লোকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ধানহাটার লাগোয়া উত্তর দিকে নদী এবং পশ্চিম দিকে খাল। নদী ও খালে থাকে ধান ও মুগডাল বেচাকেনার অসংখ্য নৌকা। বঙ্গবন্ধু আসবেন শুনে দুপুর থেকে গয়না নৌকা ও আশপাশের কয়েকখানি ঘর-বাড়ির ছাদে এবং গাছের ডালে ডালে মানুষ আর মানুষ। মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় রাইস মিলসের পাশেই একটি আমড়া গাছের ডালে অনেকগুলো ছেলে। হঠাৎ মড়মড় শব্দ করে বড় ডালটি ভেঙে পড়ে। ভাগ্যিস ডালটি রাইস মিলসের টিনের চালায় গিয়ে আটকে পড়ায় রক্ষা। আমরা বাউফল হাইস্কুলের ছেলেরা বেশির ভাগই ছিলাম গার্লস হাইস্কুল লাগোয়া রাস্তার উপর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয়বার বাউফল আসেন ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ২০ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে।

১২ নভেম্বর ১৯৭০ গোটা দক্ষিণাঞ্চলে ঘটে যায় মহাসাইক্লোন। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের হিসেব মতেই প্রাণহানির সংখ্যা ৫ লক্ষ; প্রকৃতপক্ষে প্রাণহানি ঘটে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষের। ভেসে যায় লক্ষ লক্ষ গবাদি পশু। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানুষের ঘরবাড়ি। সাইক্লোনের পরেই বঙ্গবন্ধু একটি দোতলা লঞ্চে তোফায়েল আহমেদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ছুটে আসেন দক্ষিণাঞ্চলে। এই সময়ে তিনি কালাইয়া বাজারে নামেন এবং ত্রাণ বিতরণ শেষে চলে যান আরও ভাটির পথে। কোনও জনসভা হয়নি। এই মহাদুর্যোগে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু আলাদা আলাদা একাধিকবার দুর্গত এলাকা সফর ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করলেও পাকিস্তান সরকারের কোনও শীর্ষ কর্মকর্তা উপদ্রুত এলাকায় আসেননি।

সাত মার্চ ১৯৭১। রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। স্বনামে ফিরে যাওয়ার স্বপ্নে উদ্বেলিত বাংলাদেশ। সম্ভবত মার্চের শেষ সপ্তাহ। আমি সবে নিউ টেনের ছাত্র। স্থানীয় থানা পুলিশের সহায়তায় বড় ভাই আবুল কালাম খানের (কলম খাঁ) নেতৃত্বে বাঁশের লাঠি হাতে আমরা ছোট বড় ৫০/৬০টির মতো ছেলে পাবলিক ফিল্ডে প্রতিদিন বিকেলে ট্রেনিং নিচ্ছি। থানার তরুণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মান্নান ও সহকারী দারোগা তমিজউদ্দিন আমাদের প্রশিক্ষক। অবসরপ্রাপ্ত দারোগা প্রভাত কুমার দেবনাথও মাঝে মধ্যে আসতেন। মান্নান সাহেব পরে পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং যুদ্ধ শেষে মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন। মা বললেন যুদ্ধ করবি? হ্যাঁ বলতেই বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। কী একটা দোয়া পড়ে বললেন, যা যুদ্ধ কর। একদিন ট্রেনিং চলাকালে পাশের সরু বাউফল-কালাইয়া নদীতে (এককালে এই নদীতে জাহাজ চলাচল করত) পাকিস্তানি বাহিনীর গানবোট এসে গেছে, এই খবরে পড়ে গেল হইচই। ফোরকান ভাইয়ের (মরহুম ফোরকান হোসেন খান) নেতৃত্বে আমি ও ওহাব খাঁ এই দুই জন বাঁশের লাঠি হাতে ছুটে যাই পাবলিক ফিল্ড সংলগ্ন পোলের দিকে। পাকিস্তানি গানবোট উড়িয়ে দিতে। গিয়ে দেখি কালাইয়ার দিক থেকে আসা ছোট্ট একটি লঞ্চ ভট ভট শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। এই স্মৃতির পাতা ওল্টাতে আজও গা শিউরে ওঠে। গর্বও হয়। তবু আমার জীবনের বড় ঘটনা যুদ্ধ শেষে আনন্দ

হই-হুল্লোড় আর পতপত করে উড়তে দেখা বিজয়ের এক নতুন পতাকা। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কি পরের বছর গোড়ার দিকে সম্ভবত মোস্তফা মৃধা (আমার মায়ের মামাত ভাই) অথবা বড়দের অন্য কেউ আমার হাতে অনেকগুলো কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলেন, রাখ। চাইলেই দিবি। কর্নেল (পরে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানী স্বাক্ষরিত মুক্তিযুদ্ধের (মিলিশিয়া) অনেকগুলো সার্টিফিকেট। মাকে রাখতে দিই। কত মুক্তিসেনা ও অমুক্তিযোদ্ধা মাকে চাচি-খালা ডেকে বিজয়ের সালাম করে সার্টিফিকেট নিয়ে নেয়। নিজের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের জন্য একবারও একখানি সার্টিফিকেটের কথা ভাবেননি আমার মা। শৈশব থেকে দেখে আসছি আমাদের বাড়ির আম, জাম, পেয়ারা, বিলাতি গাব, বাতাবি লেবু, কামরাঙা ইত্যাদি ফল পেকে ওঠার আগ থেকে পাড়া বা গাঁয়ের ছেলেদের বিনা বাধার লোভনীয় বস্তু। আমাদের কেউ তেড়ে গেলে মায়ের এককথা– তোদের কত চাই, ওদের খেতে দে। এভাবেই আমার মা হয়ে ওঠেন জগতের সকল সন্তানের মা।